একবিংশ শতাব্দী ও বাংলাদেশ

সম্পাদনা
গোলাম আবু জাকারিয়া

বাংলাদেশ অধ্যয়ন ও উন্নয়ন কেন্দ্র, জার্মানি

2001

৪১-96

অনুদান, সার্ক ও বিশ্বায়ন : কোন পথে সোনার বাংলা

ভল্ফগাং পেটার সিঙ্গেল

সূচনা

গত ১৯৯৯ সালের শেষের দিকে ঢাকায় একটি 'গোলটেবিল' বৈঠকে বাংলাদেশের সোনালি ভবিষ্যতের ওপর আমাকে 'মূল প্রবন্ধকার' হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল। আমন্ত্রণটি আকর্ষণীয় বলে প্রত্যাখ্যান করতে না পারলেও প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে যথেষ্ট অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম। অস্বস্তিকর পরিস্থিতির কারণ অনেক। সেমিনারের বক্তব্য অনুযায়ী স্নায়ুযুদ্ধের অবসানে বাংলাদেশ একটি নেগেটিভ ভাবমূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। দাতারা সাহায্যকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার কথা বললেও এইসব সাহায্য বা অনুদান ঋণ সর্বদাই তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত হয়। স্নায়ুযুদ্ধে জয় এবং অবসানের পর শিল্পোন্নত দেশগুলি তাদের স্বার্থের কারণেই সাহায্য অন্যত্র স্থানান্তরিত করে। সাহায্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল পরামর্শ এবং বাংলাদেশকে এই পরামর্শের বটিকা অন্য যে কোনো দেশের চাইতে বেশি করে গিলতে বাধ্য করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমার এক বাংলাদেশী বন্ধুর অভিযোগ 'কয়েক বছর পরপরই তারা কিছু নতুন রোগ নির্ণয়পত্র ও প্রতিষেধক নিয়ে আসেন'। আমিও এই ভেবে সতর্ক হলাম— হয়ত বা একই ধারাবাহিকতায় সস্তা উপদেশ দিতে যাচ্ছি।

ইতঃপূর্বে বাংলাদেশে কিছু সাহায্য সংস্থার উপদেষ্টা হিসেব অবস্থানকালে লক্ষ করেছি— বেশ কিছু বিদেশী সাহায্য নির্ভর সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা প্রশংসনীয় কাজ করেছে। কিন্তু আমি ভেবে অবাক হই, কেমন করে একটি সরকার অনবরত বিভিন্ন শর্তের বেড়াজালে থেকেও উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে।

সম্ভবত এ বিষয় আমাকে এখানেই ক্ষান্ত দিয়ে আমার ওপর অর্পিত দায়িত্বে নজর দিতে হবে। কেননা যেহেতু সম্পাদকের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে চলতি বইয়ে আমার ক্ষুদ্র অবদান রাখতে সম্মত হয়েছি, আমাকে তার সম্মান দেখাতে হবে এবং তা নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই শুরু করতে হবে। জার্মানির যুদ্ধোত্তর 'অলৌকিক অর্থনৈতিক উত্থান' আজ ইতিহাস। ১৯৬৭ সালেই আমাদের প্রথম মন্দা এসেছিল এবং পরে প্রবৃদ্ধি আর পূর্বাবস্থায় উপনীত হয়নি। অন্যান্য দেশে বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোই আজ অনুকরণীয় মডেল। সে যাই হোক না কেন ১৯৫০ ও ১৯৬০ দশকের জার্মানি ও জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে বিশ্বের অপরাপর অঞ্চলের ১৯৭০ এবং ১৯৮০-র দশকের সংঘটিত উন্নয়নের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। কেননা, আমাদের সমস্যা ছিল প্রধানত অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্ধারণ, অপরদিকে দক্ষিণের দেশগুলোর সমস্যা ছিল শূন্য থেকে শুরু করার। যদিও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে স্বাধীনতার পর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ ঔপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক ধ্বংস করা অর্থনীতি পুনর্গঠন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচনায় স্থান দিয়েছিলন (১, ৮)।

ইউরোপের মতোই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছিল। সেই অনুপ্রেরণায় দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষ করে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (SAARC) গঠনের উদ্যোগী হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, প্রকৃত 'ব্যাঘ্রদের' মধ্যে কেবল সিঙ্গাপুরই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (ASEAN) সদস্য ছিল, অপর তিনটি (ব্যাঘ্র) যেমন, কোরিয়ান প্রজাতন্ত্র, তাইওয়ান এবং হংকং নিজ নিজ অবস্থানে উক্ত সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই শেষোক্ত দেশসমূহের সাফল্য এসেছে বিশ্ববাজারের সাথে একীভূত হয়ে, আধুনিক ভাষায় যাকে বিশ্বায়ন নামে অভিহিত করা হয়। বিশ্বায়ন বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্যবহৃত এবং বর্তমানে অতি ব্যবহৃত একটি প্রবঞ্চনাকারী শব্দ (৭); যার অর্থ বিশ্বের সকল পণ্যের অধিক সমন্বিত বাজার (প্রাগুক্ত), যদিও এটি এখনও অর্থনীতিবিদদের নিকট অস্পষ্ট। তবে এর সাথে স্বত্বাধিকার, শ্রম, সেবা এবং বিনিয়োগকে ধরলে এর অর্থ ভিন্ন হবে।

বৈদেশিক সাহায্য

প্রকৃতপক্ষে বিষয়গুলো খুবই জটিল এবং বহুল প্রচলিত ও আলোচিত। কিছু চিন্তাধারা ও তর্কের সরব উপস্থিতির কারণে এই বিষয়ের উৎস ও যোগসূত্র খুঁজে বের করা বেশ দুরূহ। দক্ষিণ এশিয়ার ওপর লিখিত বইপুস্তকসমূহ রচিত হয়েছে বিভিন্ন উন্নয়ন মডেলকে কেন্দ্র করে। যেখানে উৎপাদনের মাত্রা নির্ধারণ, বিনিয়োগ ও মূলধনের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনায় নিয়ে আসা হয়েছে। যদি বাজারে কোনো একটি বিশেষ পণ্যের অভাব দেখা দেয়, তা পূরণ হতে পারে মজুত, উৎপাদন বা আমদানি থেকে। মজুত থেকে সরবরাহ করে কেবল স্বল্পকালীন চাহিদা মেটানো যায়, অন্যথায় পণ্য দেশে উৎপাদন করে অথবা আমদানি করে চাহিদা মেটানো হবে। এ দুটি বিকল্প পথের জন্যই প্রয়োজন অর্থ, যা হয় বিনিয়োগযোগ্য পণ্য (যেমন যন্ত্রপাতি, যাতায়াতের উপকরণ নির্মাণ সামগ্রী) উৎপাদনে অথবা আমদানিতে ব্যয় করতে হবে। যদি সে সমস্ত দেশ বিনিয়োগযোগ্য পণ্য উৎপাদন করতে না পারে তাহলে এসব দেশে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগযোগ্য পণ্য আমদানি করার দরকার হয়। যেহেতু সকল আমদানি পণ্যের ব্যয় মেটাতে হয় বিনিময়যোগ্য মুদ্রা দিয়ে, সেই ক্ষেত্রে আমরা দুটি ফাঁক খুঁজে পাই; একটি বিনিয়োগ ফাঁক, অপরটি মুদ্রা ফাঁক। বৈদেশিক সাহায্য এ দুটি ফাঁককে একসাথে বন্ধ করে দেয় বলে মনে হয়। আমি এই সমস্যা পরে আলোচনা করছি।

এটা আজকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, কেন দীর্ঘদিন ধরে বৈদেশিক সাহায্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বৈদেশিক সাহায্যে প্রধানত চারটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান— (১) পণ্য ও সেবা, (২) আর্থিক উপকরণ, (৩) বৈদেশিক মুদ্রা এবং (৪) প্রযুক্তিগত জ্ঞান। সকল পণ্য, সেবা অথবা তহবিল যা সাহায্য হিসেবে আসে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবহৃত না-ও হতে পারে। অথচ সাহায্যের নামে আসা এসবের বিরাট অংশ শেষপর্যন্ত গ্রহীতা দেশের একটি ক্ষুদ্র এলিট শ্রেণীর ভোগে ব্যবহৃত হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে এ সাহায্য উৎপাদনবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়— উদাহরণ স্বরূপ কৃষিপণ্য আমদানির কারণে স্থানীয় উৎপাদন হ্রাস পায় যাতে ভোক্তা উপকৃত হলেও কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

'তৃতীয় বিশ্বের' সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা শুরু হয়েছে ১৯৬০-এর দশকের শুরুতেই এবং অনেকেই এই নির্ভরশীলতাকে উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবেই দেখেছে। বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ওপর ব্যর্থ প্রচারণা চালানো হয়েছে। কারণ, বিচ্ছিন্ন থেকে আধুনিক গতিশীল অর্থনীতির পক্ষে কৌশল নির্ধারণ, পণ্যের নকশা তৈরি, উন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি সংগ্রহ সম্ভব হয়নি। উদাহরণস্বরূপ প্রাথমিক পর্যায়ে ভারত কর্তৃক গাড়ি তৈরিতে ব্যর্থতা। অনেক বিলম্বে হলেও কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত জাপানের সহযোগিতায় সুজুকি মারুতি নামে গাড়ি তৈরি করেছে। বিকল্প হিসেবে যৌথ উদ্যোগের আত্মনির্ভরশীল কৌশলকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিষদ (Comecon) তেমনি একটি প্রচেষ্টা। পূর্ব ইউরোপে এই সংস্থার একটি বিশাল বাজার ছিল। এটা অনেক ফলদায়ক হতে পারত যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন প্রযুক্তিভিত্তিক পণ্য তৈরির একচ্ছত্র দায়িত্ব না নিয়ে কিছু কিছু দায়িত্ব নিয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নত সহযোগী যেমন চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানি, হাঙ্গেরি এবং পোল্যান্ডের ওপর ছেড়ে দিত।

সার্ক

অন্যান্য আঞ্চলিক সহযোগিতার মতোই সার্ক গঠনের পশ্চাতেও ছিল অর্থনীতিতে উৎপাদনের সুযোগ সুবিধাসমূহকে কাজে লাগানো। আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক এবং অপরাপর বাণিজ্য অবরোধ হ্রাস এবং পর্যায়ক্রমে বিলুপ্ত করে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অবাধে পণ্য চলাচল করতে দেয়া এবং এই সুবিধার ফলে বিশেষীকরণের প্রসার ঘটবে, যা উৎপাদন ব্যয়ের হ্রাস ঘটিয়ে সকল সদস্য দেশকেই সুবিধা দেবে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের ক্ষেত্রে এ সুবিধা প্রাপ্তি ঘটেছে খুব কমই।

কারণ খুবই সোজা, সার্কভুক্ত দেশসমূহ বাণিজ্য বাধাসমূহ হ্রাসে কোনো ব্যাপকভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে সবচাইতে শক্তিশালী দুটি দেশ পাকিস্তান ও ভারত যতদিন যুদ্ধাবস্থায় লিপ্ত থাকবে ততদিন সে ধরনের ব্যাপক বাণিজ্য সুবিধার আশা করা অবাস্তব। ফলে সার্ক দেশসমূহের আন্তঃবাণিজ্য সমগ্র বৈদেশিক বাণিজ্যের মাত্র শতকরা ৪ ভাগে ওঠানামা করছে, যা ১৯৮০-র দশকের মধ্যভাগে সার্ক গঠনের সময়ও অনুরূপ ছিল। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ সমগ্র রপ্তানির মাত্র শতকরা দুই থেকে তিন ভাগ সার্ক দেশসমূহে প্রেরণ করেছে, যা ১৯৮০ সালের চাইতে কম। কিন্তু সে তুলনায় আমদানি বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। অদূর ভবিষ্যতে এই সম্পর্কের হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা কম। উল্লেখযোগ্য যে, বস্ত্রশিল্প রপ্তানি তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করে নিয়েছে এবং এই পণ্য রপ্তানি হয় প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহে। আমদানিকৃত শিল্পপণ্য আসে প্রধানত পূর্ব এশিয়া থেকে এবং এসব পণ্যের ব্যয় মেটানো হয় মূলত বিদেশ থেকে প্রাপ্ত ঋণ ও অর্থ সাহায্যের দ্বারা, যার উৎস পশ্চিমা শিল্পায়িত দেশ বা তাদের অধীনস্থ বিশ্বব্যাংক বা আর্ন্তজাতিক মুদ্রা তহবিল। অবশ্য অদৃশ্য বাণিজ্যখাত অর্থাৎ প্রতিবেশী দেশের সাথে চোরাচালানির মাধ্যমে যে পণ্য আদানপ্রদান হয়, তার পরিমাণ সমগ্র সার্কভুক্ত দেশসমূহের সাথে বৈধপণ্যের আমদানি ও রপ্তানিকৃত পণ্যের পরিমাণের চাইতে অধিক। প্রকৃত তথ্যের অভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত কিংবা অসমর্থিত

অভিযোগ উত্থাপন করা হয় এবং সেইসাথে সীমান্ত সংরক্ষণ সম্পর্কিত ঘটনাবলি অনেক সময় অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কোন্দলের কারণ হয়ে দেখা দেয়।

সার্কদেশসমূহ বাংলাদেশের রপ্তানিপণ্য অনায়াসে গ্রহণ করবে বা বাংলদেশের আমদানি চাহিদা তাদের থেকে মেটানো যাবে, কিংবা দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ শিল্পায়িত দেশসমূহের মতোই সুবিধা (ঋণ ও অনুদান) প্রদান করবে, বাংলাদেশের পক্ষে এমন আশা করা কঠিন। তাই সার্ক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করবে এমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে সার্ক ব্যর্থ। সার্ক স্পষ্টতই বৈদেশিক নীতি ও জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটাই একমাত্র প্রধান আঞ্চলিক সহযোগী সংস্থা, যা শত্রুভাবাপন্ন দেশসমূহকে এক বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ভেঙে পড়লে এই একমাত্র প্লাটফর্মেই সব বিষয়ে আলোচনা করা যায়। বেশ কিছু প্রযুক্তি বিষয়ক ক্ষেত্রে সহযোগিতা শুরু হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে এই সহযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। তেমনি একটি ক্ষেত্র হতে পারে দুর্যোগ মোকাবেলা, ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস, উপশম ও ব্যবস্থাপনা। কেননা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি দেশের রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম করে আঘাত করে। যেহেতু বাংলাদেশ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় অবস্থিত, তাই প্রায়ই বন্যায় আক্রান্ত হয় এবং বিগত বছরে এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়ে অতীতের চেয়ে অধিক এলাকা প্লাবিত করেছে। বেশি আক্রান্ত হয় বলে বাংলাদেশই ফলপ্রসূ সহযোগিতায় বেশি আগ্রহী, যার মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে অধিক পানি এবং বর্ষাকালে অপেক্ষাকৃত কম পানি সরবরাহ নিশ্চিত করবে। হিমালয়ের বনাঞ্চল নিধন এবং ভূমিধ্বস দ্রুতবেগে বৃষ্টি ও বরফের পানিপ্রবাহের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ নয়; উজানে বাঁধ নির্মাণের ফলে ভারতীয় অঞ্চলে ক্ষতির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। কেননা এর মাধ্যমে ভারত পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। গঙ্গা এবং শাখা প্রশাখা থেকে স্থানান্তরিত সব পানিই সেচের জন্য ব্যবহৃত হয় না। অধিকাংশ পানি বাষ্পীভূত এবং ক্ষরণের (শুষ্ক মাটি যাকে শুষে নেয়) কারণে নিঃশেষ হয়ে যায়। সেই কারণেই বাংলাদেশ ভারতের সাথে কার্যকরী সেচ প্রকল্পে অধিক আগ্রহী হবে যা শুষ্ক মৌসুমে অধিক পানি সরবরাহ করবে এবং এরই মাধ্যমে দুই প্রতিবেশী দেশের উত্তেজনা প্রশমিত হবে। দুর্ভাগ্যবশত দ্বিপাক্ষিক নীতিকে আঁকড়ে ধরে ভারত উপকূলীয় সকল দেশের সঙ্গে পানি সমস্যাকে নিয়ে আলোচনায় না বসে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে পৃথক পৃথক আলোচনাকে প্রাধান্য দিচ্ছে। সদ্য বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও ভারতকে নিয়ে গঠিত 'উন্নয়ন চতুর্ভূজ' যাকে মিনি সার্ক নামে অভিহিত করা হয়— উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে কোনো অবদান রাখবে কিনা তা এখনও দেখার বিষয়।

আশিয়ান-এর অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, আঞ্চলিক সহযোগিতা থেকে প্রাপ্ত সুবিধাকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়। যেখানে আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী কিন্তু সংস্থার সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বৈদেশিক বাণিজ্যের একপঞ্চমাংশ, (১০) যা এ অঞ্চলের প্রত্যাশ্যার তুলনায় যথেষ্ট নয়। এ বাণিজ্যের প্রায় অর্ধেকই সংগঠিত হয় আঞ্চলিক যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল সিঙ্গাপুরের সঙ্গে। তবে স্পষ্টতই সামাজিক, শিক্ষা ও ভৌত

অবকাঠামোতে (বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা) পর্যাপ্ত বিনিয়োগ এবং সেই সাথে কার্যকরী নীতিমালা সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার অর্থনীতির ভিত্তি তৈরি করেছে। সে সঙ্গে এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে, ভিয়েতনামে যুদ্ধের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে সাহায্য দেয়া ছাড়াও প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন উপখাতে অনেক বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে।

এ সমস্ত বিষয়ের পাশাপাশি আরও যেটি উপলব্ধি করা প্রয়োজন; তা হলো হংকং, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র এবং তাইওয়ান (এবং পূর্বে জাপান) কোনো আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার সদস্য হওয়া ছাড়াই উল্লিখিত অবকাঠামো তৈরিতে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর নীতিমালা গ্রহণে সফলকাম হয়েছিল। 'ব্যাঘ্ররা' মূলত যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্ট একটি নিশ্চিত বাজারের সুবিধা পেয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের বাজার খুলে দেয়া তাদের কাছে অনেক দেশ থেকে বৈদেশিক সাহায্যের চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা ছিল সুনিয়ন্ত্রিত। তাই একথা বলাই বাহুল্য যে, ধনীদেশ কর্তৃক দরিদ্র দেশ থেকে আমদানি, ধনীদেশগুলোর জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। অপরদিকে ধনী দেশে রপ্তানি দরিদ্র দেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ ১৯৯৭ সালে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে জার্মানির স্থান পঞ্চম (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, হংকং ও জাপানের পরে) কিন্তু আমদানিতে স্থান ছিল ত্রয়োদশ, ঠিক স্লোভেনিয়া এবং স্লোভাকিয়ার সমান, যদিও শেষোক্ত দেশের জনসংখ্যা ভারতের একটি জেলার গড় জনসংখ্যার সমান (১০)।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন সার্ক এবং আশিয়ানের তুলনায় আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকর। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একমাত্র রাজনৈতিক অস্থিরতা অর্থাৎ যুদ্ধপূর্ব, যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধপরবর্তী সময় ছাড়া সর্বদাই ইউরোপীয় দেশসমূহে পণ্য চলাচল অনেক বেশিমাত্রায় বিরাজমান ছিল। তাছাড়া ইউরোপীয় দেশসমূহ ভৌগোলিক বিচারে তুলনামূলকভাবে ছোট এবং ঐতিহ্যগতভাবে সব দেশের সাথে সড়ক, রেল এবং নৌপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ছিল। এরই ফলে তথাকথিত বেনেলাক্স দেশসমূহের অর্থাৎ বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গের উন্নয়ন সহযোগিতার সাফল্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছে। সেঙ্গেনের (Schengen) চুক্তির পূর্বের এ সমস্ত দেশের মধ্যে বিনা বাধায় সীমান্ত অতিক্রম করার অনুমতি ছিল। আজ অবশ্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মাত্র একটি দেশের ভিসায় ইউনিয়নভুক্ত প্রায় সকল দেশে ভ্রমণ করা যায়।

কিন্তু বিরাজমান বাণিজ্যিক বৈষম্য এবং পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বৈরিতার কারণে উপলব্ধি করা সত্যিই কঠিন যে, কীভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য (SAPTA) বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে ভগবতি এবং সংশ্লিষ্ট মহলের মতে (৩) অনেক রাজনীতিবিদ এবং অধিকাংশ প্রচার মাধ্যম মুক্তবাণিজ্য এবং অবাধ বাণিজ্য এলাকার পার্থক্য না বুঝেই বিশ্বব্যাপী অবাধ বাণিজ্য এলাকার পক্ষে (পিটিএস) ওকালতি করে থাকেন। যদিও অবাধ বাণিজ্য এলাকায় অগ্রাধিকার-বাণিজ্যের গুরুত্ব নেই বললেই চলে। ভারত বাংলাদেশের বৃহৎ প্রতিবেশী হওয়ায় এদেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক বজায় রাখা মুক্তবাণিজ্যের সুবিধার কারণে সার্কের চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অপরদিকে যেহেতু

ভারত সার্কভুক্ত যে কোনো দেশের চাইতে বড় সেহেতু তার সার্কে যোগদান রাজনৈতিক দিক দিয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বায়ন

সার্ক গঠনের যৌক্তিকতাকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা হলেও বর্তমানে বিশ্বায়নের প্রচেষ্টার পিছনে প্রধান কারণ অর্থনৈতিক। বাণিজ্যতত্ত্ববিদদের মতে বিশ্বায়নের পক্ষে প্রধান যুক্তি হলো আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগ এবং পারস্পরিক বিনিময়ের ভিত্তিতে হোক বা না হোক সকল দেশই এর সুবিধা ভোগ করবে। অবশ্য সব দেশের জন্য এই সুযোগ সুবিধা একইসঙ্গে আসবে না। যখন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রাম করছিল তখন পাটই ছিল দেশের একমাত্র সম্পদ। ১৯৬০-এর দশকে অবিভক্ত পাকিস্তানে পাটই একমাত্র বৈদেশিক মুদ্রা আহরণকারী সম্পদে পরিণত হয়েছিল। পরিবর্তিত অবস্থায় পাট তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে এবং পোশাক শিল্প তার স্থান দখল করে। একইভাবে এটা আশা করা অমূলক হবে না যে আগামী এক এবং দুই দশকে অর্থনীতির অপরাপর খাতেও তেমনি পরিবর্তন আসবে।

বাণিজ্য বাধা অপসারণের ফলে কাঠামোগত পরিবর্তন চূড়ান্ত রূপ নেবে এবং যদি এই প্রক্রিয়াকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়া হয় তাহলে অনেকেই সমূহ ক্ষতির স্বীকার হবে। এর জ্বলন্ত উদাহরণ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প যা বিশ্বের অনেক ছোট দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এবং আন্তর্জাতিক বাজার দরের বেশি মূল্যে পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। এইসব কারখানা বন্ধ করার অর্থ শ্রমিকদের 'মুক্ত' করে দেয়া অর্থাৎ অধিক মজুরিতে নিয়োজিত এই শ্রমিকদের ছাঁটাই করা। বিকল্প কাজের সম্ভাবনা খুবই কম আর পাওয়া গেলেও অনেক কম মজুরিতে এবং পূর্বোক্ত দক্ষতা এবং যোগ্যতাকে রাতারাতি খুইয়ে। চীন এমনই একটি কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় আছে, যদিও এখানে অনেকেই প্রবৃদ্ধি ও আয়বৃদ্ধির সুবিধা পাবে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ শ্রমিক তাদের আয় এবং চাকুরি দুটোই হারাবে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি পুঁজিবাদের একটি কুৎসিত চেহারাও প্রদর্শন করছে।

এ সবকিছুই বিশ্বায়নের ফল নয়। কেননা বিশ্বায়নের অর্থ শুধু পুঁজিবাদ আর মুক্তবাজার নয়। এমনকি একে যদি আমরা মুক্তবাজারের অনুরূপ ভাবি তাহলে বাণিজ্যের সংজ্ঞা নির্ধারণেই আমাদের সমস্যায় পড়তে হবে। এটা বুঝতে হলে আমাদের বাণিজ্য ভারসাম্যে তাকাতে হবে। কোনো পণ্য সীমানাকে অতিক্রম করা মাত্রই তার বাজার মূল্যকে প্রভাবিত করবে। কিন্তু যখন পর্যন্ত আমরা এই পরিমাণকে লেনদেনের ভারসাম্যের সাথে তুলনা করি, তখন আমরা যে জটিলতার সম্মুখীন হই তা হলো পরিবহণ মাশুল, বীমা, সুদ ও অভিবাসিত শ্রমিকের বিষয়টি কীভাবে বিবেচিত হবে। লেনদেনের ভারসাম্যের দিকে তাকালে দেখা যায় কেবলমাত্র রপ্তানি ও আমদানির সংখ্যাতত্ত্বের বাইরেও (যা বিভিন্ন কারণে লেনদেনের ভারসাম্যের হিসেবের আওতায় পড়ে না) বাণিজ্য, সেবা ও পরিবহণের বিষয়টিও লেনদেনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের কর্মতৎপরতা মূলত লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসেবের দিকেই নিবদ্ধ কিন্তু পণ্য বাণিজ্যের দিকে উৎসাহী নয়।

উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের লেনদেনের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ১৯৯৩-'৯৪ সালে পণ্য বাণিজ্যে (আমদানি-রপ্তানি ক্ষেত্রে) ৫০ বিলিয়ন টাকার ঘাটতি হয়েছে, অপরদিকে চলতি লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছে ১ বিলিয়ন টাকা। এটা সম্ভব, কেননা যোগাযোগ মাশুল ও বীমাক্ষেত্রে প্রদেয় সেবায় আর্থিক ঘাটতি ১৭ বিলিয়ন টাকা, অপরাপর পণ্য ও সেবায় উদ্বৃত্ত ১ বিলিয়ন টাকা, বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয়ে ঘাটতি ১ বিলিয়ন টাকা (সুদ হিসেবে প্রাপ্ত আয়), এর সঙ্গে বেসরকারি সূত্রে প্রেরিত অর্থ (বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থ) ৫০ বিলিয়ন টাকা এবং সরকারি সুদে প্রাপ্ত অর্থ (বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান, মজুরি সাহায্য ইত্যাদি)। মাত্র দুই বছর পরে, ১৯৯৫-'৯৬ সালে আমদানি বৃদ্ধির কারণে লেনদেন ভারসাম্যের বাণিজ্য ঘাটতি ৯৪ বিলিয়ন টাকা প্রায়ই চলতি হিসেব ভারসাম্যের ঘাটতি ৬০ বিলিয়ন টাকার অনুরূপ হয়ে যায় (প্রাগুক্ত)।

ক্রমবর্ধমান আমদানি চালু রাখা সম্ভব হয়েছিল নিয়মিত বৈদেশিক মুদ্রা আসার কারণে এবং এটা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই কারণে যে, সরকারি খাতের তুলনায় ব্যক্তিগত খাতের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ বেশি অর্থাৎ ১৯৮৭ সাল থেকেই বিদেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশী শ্রমিকদের পাঠানো অর্থের পরিমাণ বিদেশী দাতাদের কাছ থেকে অর্থ ও পণ্যের আকারে প্রাপ্ত অনুদানের চাইতে বেশি।

দক্ষিণ এশিয়ার অপরাপর দেশসমূহের সার্ভিস বা সেবাখাত অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে— যেমন ভারত। প্রাথমিক অবস্থায় দেখলে মনে হবে এই দেশটি আর সবার মতোই একই কাঠামোগত সমস্যায় জড়িত। ১৯৯৭-৯৮ সালে লেনদেন ভারসাম্যে বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ৫০৮ বিলিয়ন রুপি। অপরদিকে সেবাখাতে ঘাটতি ছিল ৮৯ বিলিয়ন রুপি। অর্থাৎ সরকারি খাতে ১৩ বিলিয়নের বিপরীত ব্যক্তিখাতে ৪৩৮ বিলিয়ন রুপি যা চলতি হিসেবে ভারসাম্যে ঘাটতি মাত্র ২৪৫ বিলিয়ন রুপি, সেবাখাতে ঘাটতির প্রধান কারণ সুদ প্রদান এবং যাতায়াত। উল্লেখ্য, ভারতে আন্তর্জাতিক পর্যটনখাতের আয় উদ্বৃত্ত। সেবা রপ্তানিতে বিপুল সম্ভাবনার কারণে ভারত অচিরেই সেবাখাতের ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত অর্জন করবে। যদি সেবাখাতের ভারসাম্যের পরিমাপে দেয় সুদ বাদ দেই তাহলে ভারত ইতোমধ্যেই একটি নীট সেবা রপ্তানিকারক দেশ। আর যদি প্রবাসীদের পাঠানো অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করি তাহলে সুদ প্রদান করেও ভারত নীট সেবা রপ্তানিকারক দেশ।

অবাধ বাণিজ্য বা বিশ্বায়নের সংজ্ঞা নিয়ে ইতোমধ্যেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ১৯৯৯-এর Seatle অবাধ বাণিজ্য আর 'বিশ্বায়ন' কী অন্তর্ভুক্ত হবে— এ নিয়ে ইতোমধ্যেই প্রশ্ন এবং প্রতিবাদ উত্থাপন করা হয়েছে। অর্ধশতাব্দী পূর্বে বিশ্ববাণিজ্যিক সংগঠনের প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েছে সে ব্যাপারে তেমন একটা জানাজানি হয়নি। কয়েক দশক যাবৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গ্যাট-এর নীতিমালাকেই অনুসরণ করে আসছে। যুক্তরাষ্ট্রের চাপে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন কৃষিকে বাদ দেয়া হয়েছে। পরপর কয়েকটি বৈঠকে আলাপ আলোচনার পর গ্যাট-এর নীতিমালা উন্নত করা হয়েছে। শেষের উরুগুয়ে রাউন্ডের বৈঠকে কৃষি ও পোশাক শিল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর সাথে বাণিজ্য বিষয়ক মনোজাগতিক সম্পত্তির অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) সৃষ্টি করা হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশেসমূহ এর

সাথে শ্রমিকদের অভিবাসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছে। কিন্তু শ্রমিক ও অভিবাসনের বিষয়টি স্পর্শকাতর বিধায় তাদের এ দাবি গৃহীত হয়নি।

গ্যাট ও ডব্লিউটিও-এর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির চমকপ্রদ সম্প্রসারণের ফলে। যে সমস্ত শিল্প এতকাল যাবৎ নিষ্ক্রিয় ছিল তা আজ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জ্বালানি সম্পদ না থেকেও সুইজারল্যান্ড, জাপান, ডেনমার্ক ও হলান্ড আজ মাথাপিছু আয়ের হিসেবে পৃথিবীর সব চাইতে উন্নত দেশ। আবার উল্লিখিত খনিজ সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েও আজ এ্যাঙ্গোলা, কঙ্গো, ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার ও তুর্কমেনিস্তান পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলির কাতারে। ১৯৭০-র দশকে অর্থাৎ সিকি শতাব্দী পূর্বে অকস্মাৎ জ্বালানি সম্পদের বিপুল বৃদ্ধি পাবার পরেও মাত্র কয়েকটি তেল সমৃদ্ধ দেশ শিল্পোন্নত দেশের সম পরিমাণ জিডিপি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯৯ সালের প্রথম দিকে তেলের মূল্য কমে (প্রকৃত মূল্যে) প্রথম বিপর্যয়ের সমপর্যায়ে নেমে এসেছে। স্বল্পমূল্যে জাহাজে জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি (অল্প জ্বালানিতে অধিক দূরত্ব অতিক্রম) যাতায়াত খরচ হ্রাস করেছে। মেশিন ও যাতায়াতের প্রযুক্তি প্রায় একই মূল্যে বিশ্বের সর্বত্র সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। কম্পিউটার ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রযুক্তির কল্যাণে অধিকাংশ পণ্যের আকার ও ওজন হ্রাস পেয়েছে।

এ ছাড়াও ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণে কম ওজনের (হালকা ধরনের) পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। বই, রেকর্ড, ফিল্মের ফিতা, ক্যাসেট এবং ডিস্কের বিষয়বস্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে ক্যারিয়ারের চাইতে সেবার চাহিদাই বাজারে অধিক প্রতীয়মান হয়েছে। এখানে প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে নকল সম্ভব হলেও প্রকৃত মান পাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু ডিজিটাল প্রযুক্তি মান ঠিক রেখেই হুবহু নকল সম্ভব করেছে। এই কারণেই উন্নয়নশীল বিশ্বকে মেধা সম্পদ রক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করাতে যুক্তরাষ্ট্র এত উৎসাহিত হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে চীন ও পাকিস্তানের নাম করা যায় যারা সিডি ও সফটওয়্যার নকলে শীর্ষস্থান দখল করে আছে। এদের নকল পণ্য শিল্পোন্নত দেশসমূহের বাজারে ক্রমবর্ধমান হারে প্রবেশ করায় কম্পিউটার এবং বিনোদনমূলক পণ্য নকলকারীদের হাত থেকে রক্ষার্থে প্রতিনিয়ত আরও উন্নত প্রযুক্তির আশ্রয় নিচ্ছে। এখানে দুটি উদাহরণ তুলে ধরা যায়— ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার (ভিসিআর) ইতোমধ্যেই অপ্রচলিত হতে চলেছে; ভিডিও ক্যাসেটের পরিবর্তে এসেছে ডিজিটাল ভার্সেটাইল ডিস্ক (ডিভিডি) এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ডিভিডি রেকর্ডের মূল্য হাজার ডলার, ক্রেতারা বাধ্য হবে ডিভিডি কিনতে। ডিভিডি রেকর্ডারের মূল্য আরও হ্রাস পেলে ভিসিআর-এর পরিবর্তে বাসায় বিনোদনের জন্য শুধু ডিভিডি আসবে না, যেনতেন মূল্যে নকল ডিভিডিও বাজারে আবির্ভূত হবে। আর একটি অত্যাধুনিক (বৈপ্লবিক) প্রযুক্তি এমপি.তিন যা ডিজিটাল তথ্য সংক্ষিপ্ত করার মাধ্যমে মান সামান্য হ্রাস করে ইন্টারনেটে ব্যবহার করা যায়। এই এমপি.তিন মিউজিক শিল্পের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু ডিজিটাল প্রযুক্তি তথ্যের সংকোচন ছাড়াই তীব্র গতিতে তথ্য প্রচার করে। তাই উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তৈরি করা যায়। সেবা সম্পর্কিত কার্যক্রম বিশ্বের যে কোনো স্থানেই সম্পন্ন করা যায়। কম্পিউটার সফটওয়্যার রপ্তানিতে ভারতের সাফল্য শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। উড়োজাহাজ কোম্পানির জন্য ডাটা টেপ অথবা ডিস্কেটে ভরে প্লেনের মাধ্যমে আমেরিকা বা ইউরোপে প্রেরণ করা হতো। বর্তমানে ইন্টারনেটে প্রেরণ করা

হয়। আজ আমেরিকার সহযোগিতায় ভারতেই আংশিক শ্রমবিভাগের মাধ্যমে সফটওয়্যার প্যাকেজ তৈরি হচ্ছে। সময়ের পার্থক্য একটা সুযোগ এনে দিয়েছে কেননা আমেরিকায় কাজ শুরু হয়ে চলতে থাকে এবং শেষ হলে ভারতে শুরু হয়ে চলতে থাকে। স্যাটেলাইট প্রযুক্তি আন্তর্জাতিক টেলিফোনে আলাপে খরচ হ্রাস করেছে, আলাপের কেন্দ্রগুলো ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মানুষকে এত কাছে এনে দিয়েছে যে মনেই হয় না যে তারা এত দূর-দূরান্ত থেকে কথা বলছে।

এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিকভাবে পরিচালিত এই বাণিজ্য সেবার ওপর কর আরোপ করেনি যদিও কোনো কোনো অঙ্গরাজ্যে ইতোমধ্যেই চার্জ ধার্য করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে এ বিষয়টি আবার আলোচনার টেবিলে উপস্থাপন করা হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিভিন্ন দেশের শ্রমিকরা সময়ের সাথে সাথে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। এতদিনের অর্থ ও বীমাক্ষেত্রের উচ্চ পদগুলো আজ আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কিত সেবা বা সেবাখাতের দখলে যাবার পথে।

এইসব পরিবর্তনের সুযোগ নতুন আগমনকারীরা কীভাবে কাজে লাগাতে পারে, একটি দরিদ্র এবং ব্যাপক নিরক্ষর দেশ হয়েও কীভাবে উন্নত পণ্য রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হতে পারে ভারতই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতের উদাহরণ থেকে দেখা যায় কেবল কিছু কিছু চিহ্নিত ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত দক্ষতা (তথ্য, পরমাণু বিজ্ঞান ও মহাকাশ প্রযুক্তি) অর্জন ব্যাপক দারিদ্র্য দূরীকরণে নিশ্চয়তা দেয় না।

যুক্তিসঙ্গত কারণেই অনেক বুদ্ধিজীবী, আমলা এবং রাজনীতিবিদ বিশ্বায়নের সাফল্যের ব্যাপারে সন্দিহান। উদাহরণস্বরূপ ভারত সেই সমস্ত দেশের একটি যে তুলনামূলকভাবে অনেক দেরিতে মূলধন বাজার খুলে দিয়েছে কিন্তু এখনও মূলধন আদান-প্রদানের অনুমতি দেয়নি। এর কারণ, ভারত বিশেষ করে বাংলা একদা বিদেশী সামরিক শাসনকর্তার পরিবর্তে একটি ব্যবসায়ী কোম্পানি কর্তৃক শাসিত হয়েছিল। ১৮৫৮ সালে প্রথম যুবরাজ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে দায়িত্বভার নেয় যখন সমগ্র এলাকাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বৃটিশ শাসনাধীনে চলে এসেছিল। যদিও ভারতীয় উদ্যোক্তা সাফল্যজনকভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে দেশী ভারী শিল্প স্থাপন করেছিল যা স্বাধীনতা আন্দোলনে উৎসাহ যুগিয়েছে। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ জাতীয়তাবাদ এবং ভারী শিল্পের ওপরই জোর দিয়েছিলেন। তারা সরকারকে শুধুমাত্র উদ্যোগী, নতুনত্বের প্রবর্তক এবং বিনিয়োগকারী হিসেবেই চিহ্নিত করেনি, তারা এটাও ভেবেছিল স্বাধীনতা লাভ করতে হলে অবশ্যই নিজস্ব উৎস থেকে অস্ত্র সরঞ্জাম সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। নেহেরু সত্যিকার অর্থেই সোভিয়েত ইউনিয়নের উন্নতিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন (যদিও তিনি একবার এই দেশে কৃষিতে ব্যাপক সমবায় আন্দোলনের সময় ভ্রমণ করেছিলেন)। বলার অপেক্ষা রাখে না তৃতীয় বিশ্বে ভারতে নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করছিল, এ যাবৎ জেঁকে বসা ঔপনিবেশিক শক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার ওপর। পরবর্তী সময়ে ভারত, পাকিস্তান ও চীনের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র তৈরিতে ব্যর্থ হয়ে ঐ সমস্ত ক্রয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

এ সমস্ত কারণেই ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের পরি
নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল, সমাজতন্ত্রের ওপর বিশ্বাস থেকে

অপরদিকে পাকিস্তান সম্পূর্ণ উলটোপথে চলছিল। তারা
আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে) শক্তিশালী মিত্রের সন্ধান করছি
পর শুধু ভারত নয়, বাংলা ও পাঞ্জাব উভয় অঞ্চলই
করতে পারছিল না। মিশর, ইরাক, ইরান ও ইন্দোনে
থেকে সাহায্যের কথা চিন্তা করলেও পাকিস্তানকে রক্ষা
ফলে বাধ্য হয়েই পাকিস্তান পশ্চিমা সামরিক বলয়
পড়ে। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই দেখা গেল কোনো বৃ
চায় না। ভারত ও চীনের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের কারণে
শিথিল হয়ে পড়ে। তখন পাকিস্তান চীন এবং পরবর্তীক
কৌশলগত গুরুত্ব অর্জন করলে ইরান ও সৌদি আরবে
বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ব্যাপারে পাকিস্তান ভারতে
অবলম্বন করে। বৈদেশিক সাহায্য আসতে শুরু করে
যুদ্ধে লিপ্ত হলে 'বন্ধু ভাবাপন্ন দেশসমূহ' সাহায্য বন্ধ ক

ভারত, পাকিস্তান এবং পরে বাংলাদেশ ১৯৭১ সাল
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সরকারিভাবে পশ্চিমা দেশগুলি
ছিল না এবং যদিও এসব দেশ (পাশ্চাত্যের) স্বাধীন
বছরগুলিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল,
তুলনায় যথেষ্ট ছিল না। ১৯৭৪ সালে লাহোরে
কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পরই সাহায্যের
বাংলাদেশ অতিমাত্রায় ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়
সমস্ত বৃহৎ শিল্পকারখানা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছিল
স্বাধীনতার পর তা জাতীয়করণ করা হয় অর্থাৎ
মালিকানায় নিয়ে আসা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চি
দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজতন্ত্রের গন্ধ পেতে থাকে। ১৯৭
অস্ত্রহাতে বাংলাদেশকে শিক্ষা দেবার একটা সুবর্ণ
নিষেধাজ্ঞাকে ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র সে সময় অতি
করে। প্রাপ্য সাহায্যের অধিকারও হরণ করা হয়।
বাংলাদেশের আর কখনও অনুভূত হয়নি। এটা ধা
বাংলাদেশের রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করে তোলে
মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয় এবং পরবর্তী
হয়।

আর অতিরিক্ত আলোচনা না করেই বুঝতে অসুবি
দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত এবং অতীতের নিজস্ব অভি

এ সমস্ত কারণেই ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল, সমাজতন্ত্রের ওপর বিশ্বাস থেকে নয়।

অপরদিকে পাকিস্তান সম্পূর্ণ উলটোপথে চলছিল। তারা ভারতের বিরুদ্ধে (এবং কিছুটা হলেও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে) শক্তিশালী মিত্রের সন্ধান করছিল। দেশ বিভাগের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর শুধু ভারত নয়, বাংলা ও পাঞ্জাব উভয় অঞ্চলই প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তিকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। মিশর, ইরাক, ইরান ও ইন্দোনেশিয়ার মতো সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশ থেকে সাহায্যের কথা চিন্তা করলেও পাকিস্তানকে রক্ষা করার মতো শক্তিশালী তারা ছিল না। ফলে বাধ্য হয়েই পাকিস্তান পশ্চিমা সামরিক বলয় বিশেষ করে আমেরিকার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই দেখা গেল কোনো বৃহৎ রাষ্ট্রই কাশ্মীর নিয়ে জড়িয়ে পড়তে চায় না। ভারত ও চীনের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের কারণে পাশ্চাত্যের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়ে। তখন পাকিস্তান চীন এবং পরবর্তীকালে তেলসমৃদ্ধ দেশগুলি অর্থনৈতিক ও কৌশলগত গুরুত্ব অর্জন করলে ইরান ও সৌদি আরবের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ব্যাপারে পাকিস্তান ভারতের তুলনায় অনেক বেশি উদারনীতি অবলম্বন করে। বৈদেশিক সাহায্য আসতে শুরু করে কিন্তু ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারত যুদ্ধে লিপ্ত হলে 'বন্ধু ভাবাপন্ন দেশসমূহ' সাহায্য বন্ধ করে দেয়।

ভারত, পাকিস্তান এবং পরে বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে পাশ্চাত্যের দেশসমূহ থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সরকারিভাবে পশ্চিমা দেশগুলি পাকিস্তানকে সাহায্য করলেও তা যথেষ্ট ছিল না এবং যদিও এসব দেশ (পাশ্চাত্যের) স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত কঠিন বছরগুলিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু নুতন দেশ হিসেবে তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না। ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামিক সম্মেলনে পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পরই সাহায্যের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। এই সময় বাংলাদেশ অতিমাত্রায় ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। প্রায় সমস্ত বৃহৎ শিল্পকারখানা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছিল পাকিস্তানি ব্যবসায়ীদের মালিকানাধীন, স্বাধীনতার পর তা জাতীয়করণ করা হয় অর্থাৎ তা বাংলাদেশী নাগরিকদের নয়, রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম ইউরোপের দাতা দেশসমূহ সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজতন্ত্রের গন্ধ পেতে থাকে। ১৯৭৪ সালে কিউবায় পাটের থলে বিক্রির অজুহাতে বাংলাদেশকে শিক্ষা দেবার একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যায়। কিউবায় বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞাকে ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র সে সময় অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য সাহায্য স্থগিত ঘোষণা করে। প্রাপ্য সাহায্যের অধিকারও হরণ করা হয়। সে সময়ের মতো সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশের আর কখনও অনুভূত হয়নি। এটা ধারণা করা অমূলক নয় যে, এ সমস্ত ঘটনা বাংলাদেশের রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করে তোলে এবং ক্যু-এর মাধ্যমে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে আরও সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়।

আর অতিরিক্ত আলোচনা না করেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বিশ্বায়ন একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত এবং অতীতের নিজস্ব অভিজ্ঞতার কারণে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ

নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বিগ্ন। এ কারণে ভারত বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে মজুত খাদ্য বিক্রি করে ফসলহানির সময় আন্তর্জাতিক বাজার থেকে খাদ্য ক্রয়ে অস্বীকৃতি জানায় (অপর কারণ ছিল ভারতের পাঞ্জাবে উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদনকারী কৃষকদের ভরতুকির নিশ্চয়তা প্রদান)।

অপরদিকে দক্ষিণ এশিয়ার আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য উচ্চমূল্য দেয়ার অভিজ্ঞতাও কম নয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৫৬-১৯৬১) পর থেকেই ভারত ভারী শিল্পনির্ভর পরিকল্পিত অর্থনীতির কার্যক্রম শুরু করে। অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার ছিল অত্যন্ত নিচু, যাকে 'হিন্দু প্রবৃদ্ধির হার' বলে উপহাস করা হতো। মাত্র ৩.৫ শতাংশ অর্জিত প্রবৃদ্ধি শুধু পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই নয়, পাকিস্তানের চাইতেও কম ছিল। ১৯৬০-র দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পাকিস্তানের অর্থনীতি সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল। একই দশকের দ্বিতীয়ার্ধে সবুজ বিপ্লব তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য আনে। কিন্তু এই সাফল্য ছিল শুধুমাত্র গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে এবং তা কেবল পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ছিল। ১৯৭০-র দশকের শুরুতে এ অঞ্চলে ব্যাপক আকারে জাতীয়করণ শুরু হয় এবং ভারত, পাকিস্তানের (এবং বাংলাদেশের) অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ভারত খাদ্যবাণিজ্য এবং পাকিস্তান আটা ও খাদ্য তেলের মিল কারখানাকে জাতীয়করণ করার ফলে অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে। ১৯৭০-র দশকের শেষার্ধ থেকেই শুধু ভারত ও পাকিস্তানই নয়, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকাও বাজার অর্থনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে। প্রাথমিকভাবে এর কার্যক্রম ছিল কেবলই বাগাড়ম্বরপূর্ণ। কেননা বাংলাদেশ ও শ্রীলংকা এক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করলেও ভারতের আমলাতন্ত্র এবং পাকিস্তানের সেনাশাসকরা বিজাতীয়করণ ও ব্যক্তিখাতের সম্প্রসারণ শুরু করেছিল অত্যন্ত ধীরগতিতে। সামরিক শাসনের অবসান এই প্রক্রিয়ায় সহায়ক হলেও আফগান যুদ্ধের অবসান ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পতনের কারণে পাকিস্তান তার কৌশলগত গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। ফলে পশ্চিমা সাহায্য হ্রাস পায়, উপরন্তু পারমাণবিক কর্মসূচি গ্রহণের কারণে পাকিস্তানের ওপর নিষেধাজ্ঞা অরোপিত হয়। সে তুলনায় ভারত কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় থাকলেও ১৯৮০ সালের শেষ সময় পর্যন্ত ভারত অত্যন্ত রক্ষণশীল বিনিময় নীতি অবলম্বন করেছে। ফলে শোচনীয় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কিছু চাঙ্গা করতে আইএমএফ-এর দারস্থ হতে হয়েছিল।

এ সমস্ত বিপর্যয়ই প্রমাণ করবে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতি কী পরিমাণ বিশ্ববাজার, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং দাতা দেশসমূহের ওপর নির্ভরশীল। এসব কিছুর জন্য এককভাবে বিশ্বায়নকে দায়ী করা অযৌক্তিক।

নিম্নের উদাহরণগুলি উলটোটাই প্রমাণ করবে—

এক : ১৯৭৩ সালে ওপেক কর্তৃক তেলের মূল্য চতুর্গুণ বৃদ্ধি অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে, কেননা দেশের অভ্যন্তরে জ্বালানি সম্পদের অনুপস্থিতির কারণে এ সমস্ত দেশ তেল আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল। তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে ব্রাকেটে বন্দি 'অতিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশ' হিসেবে পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এই সদ্য তেল বিক্রি করে ধনী হওয়া দেশগুলো অনেকটা আশীর্বাদস্বরূপ, কেননা 'এশিয়া'র

যেসব দেশ থেকে (ইরানের পূর্বাঞ্চলের দেশগুলো মধ্যপ্রাচ্যের দেশ হিসেবে পরিচিত) লক্ষ লক্ষ শ্রমিক দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় (এবং লিবিয়া নাইজেরিয়া ইত্যাদি) পাড়ি দেয় এবং বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা নিজ দেশে পাঠায় পাকিস্তান ছিল তাদের অন্যতম। এই সময়ে শ্রমিকদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা পাকিস্তানের রপ্তানি থেকে প্রাপ্ত আয়ের বেশি ছিল, যার কারণে পাকিস্তান এক সময় বিদেশী সাহায্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারত যা ভুট্টোকে আত্মনির্ভরশীল নীতি প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং তা সম্ভব ছিল যদি সত্যিকার অর্থেই তারা সেটা চাইত (২)। ভারতও একই প্রক্রিয়ায় বিপুল শ্রমিক প্রেরণ করে এবং অচিরেই পাকিস্তান কর্তৃক প্রেরিত সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়। বাংলাদেশের জন্য এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ হতে পারত কিন্তু প্রথম দিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক কারণেই তা গ্রহণ করা হয়নি এবং কেবল তারাই যেতে পারত যাদের পরিচিতরা ইতোমধ্যেই সেখানে কাজের সংস্থান করে বসবাস করছে।

তেলসমৃদ্ধ দেশে উচ্চ প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পন্ন লোকবলের চাহিদার কারণে বেশকিছু দক্ষ প্রযুক্তিবিদ তাদের কর্তৃপক্ষের সম্মতিতেই পরিবারসহ কাজের সুযোগ করে নিয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে তারাই দেশে ফিরে তাদের অর্জিত অর্থ, প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এক নতুন উদ্যোক্তা শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে। এই প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়েছে ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে, যারা প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রে সফটওয়্যারের ওপর শিক্ষা গ্রহণ করে নিজ দেশের শিল্প বিকাশে উদ্যোগী হয়েছে তাদের। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সফটওয়্যার শিল্পে কর্মরত ভারতীয়দের সংখ্যা নিজ দেশে কর্মরত একই শিল্পে নিয়োজিতদের চাইতে অধিক (৬)।

দুই : এক সময় ছিল যখন কাঁচামালের সহজলভ্যতা শিল্পোন্নয়নের (রপ্তানিমুখী) জন্য একটি তুলনামূলক ব্যয় সুবিধা এবং অন্যতম শর্ত হিসেবে বিবেচিত হতো (উপরে লক্ষ করুন)। এটা সুবিদিত যে, পাকিস্তান বস্ত্রশিল্পে অর্থাৎ তুলা থেকে সুতা ও বস্ত্র উৎপাদনে শত শত কোটি রুপি ভরতুকি দিয়েছে। এই শিল্প কয়েক দশক থেকেই উদ্বৃত্ত উৎপাদন এবং ক্ষতির সম্মুখীন। অনেক দেরিতে হলেও পাকিস্তান রপ্তানিকারক ব্লকে যোগ দিয়েছে যদিও বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা তুলা উৎপাদনকারী দেশ না হয়েও পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যদিও এটি একটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং বাংলাদেশের মতো দেশকে মাল্টি ফাইবার এগ্রিমেন্ট (১৫) যোগ্য হবার পর আরও কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

তিন : ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে হস্তশিল্প এবং অলঙ্কার শিল্পে। প্রথম কয়েক বছর ভারতীয় প্রধান পণ্য হিসেবে এটি চালু ছিল যদিও এর অধিকাংশ কাঁচামালই (যেমন বিভিন্ন আকৃতির পাথর ও সোনা) ছিল আমদানি নির্ভর। কিন্তু লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এই সম্পূর্ণ রপ্তানিনির্ভর শিল্পে নিয়োজিত ছিল।

চার : আমি ইতোমধ্যেই সফটওয়্যার রপ্তানি বিষয়ে আলোচনা করেছি। এটা বলতে গেলে প্রায় একচেটিয়াভাবেই ভারতীয় সাফল্য এবং অন্যদেশে এর বিকাশ ঘটানো কঠিন। কারণ ইতোমধ্যেই সফটওয়্যারের বাজার অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে পূর্ব

ইউরোপ এবং চীন বিপুল পরিমাণে দক্ষ লোকবল তৈরি করে প্রতিযোগিতায় গতি এনেছে। ভারতেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে উঠেছে যাদের অধিকাংশই বিদেশে প্রশিক্ষণ শেষে নিজ দেশে আধুনিক প্রযুক্তিগত গবেষণায় (প্রতিরক্ষায়) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং প্রায়শই বিদেশী প্রযুক্তিবিদদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তাদের কর্মতৎপরতা প্রসারিত করেছে। অবশ্যই এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যুক্তরাষ্ট্র ও অপরাপর শিল্পায়িত দেশসমূহের নিশ্চিত বাজার ছাড়া এই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হতো না।

পাঁচ :- পর্যটন শিল্প বিশ্বব্যাপী একটি অন্যতম বাজারে পরিণত হয়েছে। পর্যটন শিল্পের মাধ্যমেই মালদ্বীপ দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ মাথাপিছু আয় অর্জন করেছে। বাংলাদেশের জন্যও এটি একটি বিকল্প আয়ের উৎস হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি পর্যটন শিল্প প্রসারের এই শীর্ষে এসেও বাংলাদেশ বাজার পেতে পারে যদি বাংলাদেশ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে পারে : ভারতের যেমন সংস্কৃতির বিভিন্নতা, নেপাল, ভুটান ও পাকিস্তানের পাহাড় ও পর্বতশৃঙ্গ, মালদ্বীপের সামুদ্রিক প্রাণীর দৃশ্যাবলি অবলোকন করার ব্যবস্থা, তেমনি বাংলাদেশের জন্য হতে পারে নদী ভ্রমণ।

ধরে নেয়া হয় উন্নয়নশীল দেশে পর্যাপ্ত শ্রমিক বিদ্যমান, এখানে অভাব মূলধনের কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, নতুন মূলধনের অনুপ্রবেশ ঘটলে আপনা আপনিই উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ করলে দেখা যায় উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে অতি উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি খাত বিনিয়োগে গতিশীলতা আনতে ব্যর্থ হয়েছে, ফলে বিদেশী বিনিয়োগের ওপরই ভরসা করা হচ্ছে। এ যাবৎ এই অঞ্চলের বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রায় পুরোটাই ভারতে খাটানো হয়েছে, যদিও এটা ১৯৯০-র দশকে চীনে খাটানো বৈদেশিক বিনিয়োগের একটি অনুল্লেখযোগ্য অংশমাত্র। সে তুলনায় বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ অতি সামান্য এবং বিনিয়োগের সিংহভাগই এসেছে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের (ডিএফআই) আকারে। যতটুকু বিনিয়োগ হয়েছে তার অধিকাংশ ছিল প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (ডিএফআই) যা অবশ্যই পোর্টফোলিও বিনিয়োগের তুলনায় অধিক কাম্য, অন্তত প্রযুক্তিগত জ্ঞান আহরণের জন্য হলেও।

২০০০ সালের শুরুতে এসে তেল গ্যাস শিল্প নিয়োগে যে বিতর্ক চলছে তার অবসানের ওপরই নির্ভর করছে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ। উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ এখনও অজানা, ফলে ভারতে গ্যাসের রপ্তানিকে কেন্দ্র করে একটি উত্তপ্ত বিতর্ক চলছে। ভৌগোলিক এবং প্রযুক্তিগত কারণে ভারতই প্রধান রপ্তানিযোগ্য দেশ কিন্তু প্রক্রিয়াজাত করে সার এবং অপরাপর পণ্যে রূপান্তরিত করে বিশ্বের অপরাপর স্থানেও রপ্তানি করা সম্ভব। মূলধনী হিসেবের জন্য (লেনদেন ভারসাম্যে) সাহায্যের চাইতে বৈদেশিক বিনিয়োগ অধিক কাম্য। স্টক মার্কেট এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। কিন্তু ১৯৯০-র দশকের মধ্যপর্যায়ে চরম বিপর্যয়ে বিপুল ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী সর্বস্বান্ত হবার পর ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা এসেছে।

মন্তব্য

তাহলে কী করা যেতে পারে বা করা হবে ? বৈদেশিক সাহায্য স্নায়ুযুদ্ধের সময়ের মতো গুরুত্ব আবার ফিরে পাবে এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া সাহায্য দেয়া-নেয়ার

পদ্ধতিই সবসময় ত্রুটিযুক্ত ছিল। এর চাইতে আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগ থেকে সুবিধা আদায় করা যেতে পারে। সার্ক দেশসমূহের মধ্যে সহযোগিতা এক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ অধিক সুযোগ পেতে পারে। কিন্তু এখানেই স্মরণ রাখতে হবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মৌলিক পরিবর্তনের সাথে বাণিজ্যে সেবাখাতের পরিবর্তন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে অধিক সুবিধা আদায় করে নিতে পারে যদি দেশের মূল্যবান মানব সম্পদকে কাজে লাগাতে পারে। বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার মতো জনগণকে সর্বজনীন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারেনি এবং কোনো পরিকল্পনাও নেই, কিংবা ভারতের মতো বিশ্বমাপের একটি শিক্ষিত এলিট শ্রেণীও গড়ে তুলতে পারেনি। বাংলাদেশ ভারতের মতো যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকারী বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত শ্রেণীর সাথে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করতে পারেনি। একটি কার্যকরী গণশিক্ষা যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানিমুখী উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য। সেইসাথে প্রয়োজন বাংলাদেশে বর্তমানের চাইতে বেশি সংখ্যক দক্ষ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ।

সবশেষে কৃষির ওপর মন্তব্য করা প্রয়োজন, যা এখনও অর্থনীতির প্রধান খাত। কৃষি এখনও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আয়ের প্রধান উৎস এবং সিংহভাগ কৃষি নির্ভর মানুষই হাজার হাজার গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করে।

বিশ্বায়ন থেকে আপাতত কৃষিতে বিপদের আশঙ্কা নেই। বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে যে খাদ্য আমদানি হয় তা প্রধানত প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন কম হওয়ার কারণে। কিন্তু উন্নত কৃষিভিত্তিক প্রযুক্তি গ্রহণ করে, বাণিজ্যনীতি ও আন্তর্জাতিক আইন অনুবাদ করে, পরিস্থিতির উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। যেহেতু দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের কৃষিতে সমস্যাসমূহ সহধর্মী তাই সার্ক কৃষি বিষয়টি আন্তর্জাতিক ফোরামে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হিসেবে তুলে ধরতে পারে।

ইংরেজি থেকে ভাষান্তর : **শফিক উজ জামান**